শিক্ষা সমাজ দেশ

‘ইউনাইটেড উই স্ট্যান্ড ডিভাইডেড উই ফল’

– ড. হাসনান আহমেদ

শিরোনামে উল্লিখিত প্রবাদটি কয়েকদিন আগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেতর দিয়ে রিক্সাযোগে যেতে এক প্রাচীরের গায়ে লেখা দেখলাম। রংটা চকচকে। বুঝলাম, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সময়ের লেখা। প্রবাদটি আমাদের সমাজে বহুল ব্যবহৃত। আমরা সময়ের প্রয়োজনে প্রবাদটি উল্লেখ করি, কাজের সময় ভুলে যায়। বর্তমান বাংলাদেশের মানুষ ও দেশ খুব জটিল ও অস্তিত্ব সঙ্কটের মধ্য দিয়ে সময় পার করছে। ভবিষ্যৎ পুরোটাই অনিশ্চিত কিংবা যাহা পূর্বং তাহাই পরং কিংবা আরো ভয়ংকর। পাশের দেশ তার চরণদাসের সুযোগ্য উত্তরাধিকার বিশুদ্ধ চরণদাসী, সহচর-সহচরীদের নিয়ে সে-দেশে বসে অবিরাম খেলে চলেছে; দেশকে অস্থিতিশীল করে তোলার সকল চেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। এদেশে বসবাসরত, কেউবা পদাধিষ্ঠিত তাদের খেলোয়াড়রা খেলছে ক্ষমতা দিয়ে ও টাকা ছিটিয়ে কৌশলে। প্রতিপক্ষ সাধারণ দেশপ্রেমী মানুষ, ছাত্র-জনতা, রাজনৈতিক দল, সরকার যার যার অবস্থান থেকে আঘাত সহ্য করে যাচ্ছে। চিৎকার চেঁচামেচি করছে; প্রত্যাঘাত করার ক্ষমতা সীমিত। আমরা অগত্যা যত দোষ ও ব্যর্থতার দায় অন্তর্বর্তী সরকারের ঘাড়ে চাপিয়ে নিজেরা দায়মুক্ত ও ‘কর্তব্যপালন যথেষ্ঠ করেছি’ বলে আত্মপ্রসাদ লাভ করি। কৌশলী বক্তব্য দিচ্ছি। মুখে দেশের স্বার্থকে বড় করে দেখার কথা বললেও কাজে দলীয় স্বার্থকে প্রাধান্য দিচ্ছি। আমাদের একটাই লক্ষ্য হওয়া উচিত– কোনো দলের তাঁবেদারি নয়, দেশের কল্যাণ। ইতোমধ্যেই তেপ্পান্ন বছর পার হয়ে গেছে।

অন্তর্বর্তী সরকারেরই-বা কী এমন ঠেকা পড়ে গেছে যে, নিজেদের মূল্যবান সময় ব্যয় করে তারা অন্যের সমালোচনা শুনতে চাইবে। তারা তো রাজনীতিকে ব্যবসা হিসেবে নিতে চায় না। দেশের প্রয়োজনে দায়িত্বে এসেছে। ইউনূস সরকারইবা ফ্যাসিস্ট হাসিনা-অনুসারীদের বাড়িঘর ভাঙচুরের দায় নিতে যাবে কেন! এসব অসমাপ্ত বিপ্লবেরই অংশ। তারা দেশকে যথাসম্ভব সংস্কার করে নির্বাচন দিয়ে চলে যেতে চেয়েছেন; এটাই যথেষ্ট নয় কি? সরকারে কর্মরত বিভিন্ন বিভাগের কায়েমি স্বার্থবাদী সদস্য তাদের প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করছে না, তাতে তাদের কিইবা করার আছে? সচেতন মানুষ তা বোঝেন। এটাকে আমরা শিক্ষকতার ভাষায় ‘লিমিটিং ফ্যাক্টর’ বলি। দীর্ঘ বছর ধরে দলবাজি করে সুপরিকল্পিত উপায়ে সাজানো বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে শৃঙ্খলা এত অল্প সময়ে ফিরিয়ে আনা চাট্টিখানি কথা নয়। অধিকাংশ বিভাগই এক খুরে মাথা মোড়ানো। আবার অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টা টিমে কেউ কেউ অযোগ্য থাকতেও পারেন, সবাইকে একযোগে অদক্ষ বলাটা সমীচীন নয়। আরেকটা অতি মূল্যবান বিষয় অনেকেই গুরুত্ব দিচ্ছে না– পতিত লুটেরা সরকার এদেশের সামাজিক শিক্ষা ও সমাজের মূল্যবোধ দীর্ঘদিনে পুরোটাই নষ্ট করে দিয়ে গেছে। এর প্রভাব ও মেরামত সুদূরপ্রসারী। সরকারের বিভিন্ন পর্যায়ে যারা রাষ্ট্র সংস্কারে হাত দিয়েছেন, সামাজিক এই অশুভ পরিবর্তনের বাস্তবতা তাদের ক’জন বিবেচনায় এনে বিভিন্ন বিষয় সংস্কার করতে চাচ্ছেন, সে বিষয়ে যথেষ্ঠ চিন্তার অবকাশ রয়েছে।

এ পর্যন্ত আওয়ামী দুঃশাসন কোনোদিনই কি তাদের দেশবিরোধী গর্হিত কৃতকর্মের দায় স্বীকার করতে চেয়েছে? কৃতকর্মের অনুশোচনা না থাকলে দায়ইবা স্বীকার করবে কেন? অনুশোচনা আসে আত্মোপলব্ধি থেকে, সে ক্ষমতা কি তাদের বিধাতা দিয়েছেন? অতীত বাদ দিয়েও এই ষোল বছরে তাদের প্রকাশ্য দুর্নীতি, লুটপাট, হত্যা-গুম, নির্বিচার অত্যাচার, ব্যাংক লুট, দেশবিক্রি, মিথ্যাচার, গণহত্যার আমলনামা সুস্থ কোনো মানুষ কি অস্বীকার করতে পারে? বাস্তবে তাদের স্বরূপ উদ্ঘাটিত হলো। এখন শেখ হাসিনা যেহেতু দেশ লুটপাট করে তার দলবলসহ প্রভুর কোলে ফিরে গেছেন, তারা এবার ক্ষান্ত দিলেই পারতেন। এদেশে রয়ে-যাওয়া তাদের চাটুকাররাও তা বুঝতে পারলে ভালো হতো। এদেশের প্রতি পার্শ্ববর্তী দেশের লোলুপ দৃষ্টি সেই ’৪৭ সাল থেকে আছে। ইতিহাস তা-ই বলে। তারাও এত সহজে নিবৃত্ত হওয়ার নয়। কয়লার ময়লা ধুলে যায় না। সুতরাং আওয়ামী লীগের যে কেউ এদেশে এসে আবার সবার জন্য দেশ গড়বে, এটা অচিন্তনীয়। তাছাড়া কোনো মাল ‘মেইড ইন ইন্ডিয়া’ হলে তাকে কোনোভাবেই আর ‘মেইড ইন বাংলাদেশ’ বানানো যাবে না। তারা প্রভুর দাসত্বকেই অগ্রাধিকার দেবে। এ নিয়ে

আমাদের না ভাবাই উচিত। অতীতকে নিয়ে বেশি ঘাঁটাঘাঁটি না করে ওই অধ্যায় চুকিয়ে দেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। নিজ দেশের অস্তিত্ব ও কল্যাণ নিয়ে ভাবাই সময়ের দাবি।

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন মূলত একটা বিপ্লবের নাম, সুষ্ঠু পরিকল্পনার অভাবে যদিও তা অর্ধসমাপ্ত হয়ে আছে। দেশের যে দুঃসহ-দুরবস্থা হয়েছিল, গণবিপ্লব ছাড়া কোনো আন্দোলনে তা মেরামতযোগ্য ছিল না। এ বিপ্লবের বীজের অনেক বছর ধরে অঙ্কুরোদ্‌গম হচ্ছিল। বিরোধী দলগুলো অনেক অত্যাচার-অবিচার, নির্বিচার খুন-গুমকে হজম করে সামনে এগিয়ে যাচ্ছিল। শেষতক যে ছাত্র-জনতা গুলির সামনে বুক পেতে দিয়ে বিপ্লবকে সফলতার দিকে নিয়ে গেছে তারাও কোনো না কোনো দলের সদস্য অথবা দলের প্রতি নীরব সমর্থক ছিল; সাথে যোগ দিয়েছিল সাধারণ ছাত্রছাত্রী। একটা সমীকরণ হিসাবে মেলে না, বিজয়ের পর নির্দিষ্ট দলের সদস্যরা নিশ্চয়ই নিজ নিজ দলে ফিরে যাবে, ছাত্রছাত্রীরা লেখাপড়ায় মন দেবে; তাহলে নতুন দল গঠনের এত অবশ্যম্ভাবিতা কেন? ব্রাকেটসর্বস্ব দল হতে চায়? এতে বিপ্লবে অংশগ্রহণকারী দলের নিজেদের মধ্যে অবনিবনা-মারামারি বাড়বে ছাড়া কমার কোনো লক্ষ্মণ দেখি না। ছাত্রছাত্রীরা অপরিপক্ক অথচ মেধাসম্পন্ন, উচ্ছল-আবেগতাড়িত ও ন্যায়নিষ্ঠ। দূরদর্শীতা ও অভিজ্ঞতার অভাব আছে। চলতি সমাজকে নিয়ে ভাবতে হবে। এদেশে রাজনীতির পরিবেশ জঘন্য, এটা একটা লাভজনক ব্যবসায় পরিণত হয়েছে। বিপ্লবে সহায়তাকারী একজন শিক্ষকের দাবি নিয়ে বলছি: কথাটা শ্রুতিকটু হলেও সত্য, ছাত্রদের নতুন দলগঠন অদূরভবিষ্যতে তাদের এ পবিত্র আত্মত্যাগ ও অর্জনকে ম্লান করে দেবে। তাদের যদি দেশ গড়ার উদ্দেশ্যই থাকে, তারা প্রতিটা বিশ্ববিদ্যালয়ে অরাজনৈতিক সংগঠন হিসাবে সুনির্দিষ্ট ব্যানারে ছাত্র-সংসদ নির্বাচন করতে পারে। যে-সব সদস্য বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়া শেষ করেছে তারাও একই সংগঠনের স্বেচ্ছাসেবী ব্যানারে দেশবাসীর মধ্যমণি হয়ে টিকে থাকতে পারে। পরবর্তীকালে প্রয়োজনে রাজনৈতিক দল গড়ে দেশ চালাতে পারে। বর্তমান এ অরাজনৈতিক সংগঠন হবে সুষ্ঠুভাবে দেশ-পরিচালনার 'প্রেসার গ্রুপ'। এরা হবে সব অন্যায়-বৈষম্যের ওয়াচডগ। আমার এ চিন্তাধারা 'আউট অব দ্য বক্স' হতে পারে, তবে যে-সব রাজনৈতিক দল তাদের সাথে বিপ্লবে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছিল, তাদের প্রত্যেককে সাথে নিয়ে এজজোট হয়ে দেশমাতৃকার কল্যাণ ও উন্নতিসাধনে মিলেমিশে একটা জাতীয় সরকার গঠন করাই বর্তমান সর্বোত্তম পন্থা। নইলে আওয়ামী লীগ ও ভারতের বিষাক্ত ছোবলে বছরের পর বছর অস্থিতিশীল পরিবেশ নিয়ে সময় পার করা ছাড়া গত্যন্তর নেই। সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের শুভবুদ্ধির উদয় হোক এটাই সর্বাঙ্গীণ কামনা।

(৯ ফেব্রুয়ারি '২৫ দৈনিক যুগান্তর পত্রিকার উপসম্পাদকীয় কলামে প্রকাশিত)

ড. হাসনান আহমেদ: সাহিত্যিক, গবেষক ও শিক্ষাবিদ; প্রেসিডেন্ট, জাতীয় শিক্ষা-সেবা পরিষদ।
web: pathorekhahasnan.com